সংগ্রাম চাই

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'সখার প্রতি' কবিতাটিতে লিখেছেন, "পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।" অবিচলিত, অতন্দ্র সংগ্রামই তাঁর পূজা। এ কথাটার গভীরতা ও ব্যাপ্তি অসাধারণ। স্বামীজীর এ সব কথা ভালো করে ধারণা করতে হলে খুব মননের প্রয়োজন।

সংগ্রাম কথাটা বহু ব্যবহৃত। জীবের বিবর্তনে 'struggle for existence' বা অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। কোটি কোটি জীব নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রাম করছে। তাদের মধ্যে যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটছে আর যে পরাজিত, তার অবলুপ্তি হচ্ছে। অনেক সমাজবিজ্ঞানী মানুষের ইতিহাসে 'class struggle' বা শ্রেণীসংগ্রামের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছেন। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে মানুষকে নিজের অধিকার অর্জন ও রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় জুড়ে আছে দেশে দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু সংগ্রামের কথা বলেছেন আরও ব্যাপক অর্থে। স্বামীজীর কথায়, "Man is man so long as he is struggling to rise above nature" -- মানুষ যতক্ষণ প্রকৃতির ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য সংগ্রাম করে, ততক্ষণই তাকে মানুষ বলা চলে। তার পরেই বলছেন, "... and this nature is both internal and external." সংগ্রাম শুধুমাত্র বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে নয়, নিজের অন্তরেও সংগ্রাম চলা দরকার -- অন্তঃপ্রকৃতির বিরুদ্ধে। বাইরের প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জীবমাত্রেই করে; অন্তরের সংগ্রামটা কিন্তু শুধু মানুষই করতে পারে। এটা তার বৈশিষ্ট্য, তার মনুষ্যত্বের একমাত্র পরিচায়ক।

মনের মধ্যে যে পশুভাব অর্থাৎ যে নীচতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি আছে, সেগুলোকে জয় করবার জন্য, মানুষের আসল মহিমা বিকশিত করবার জন্য নিজের মনের সঙ্গে এই সংগ্রাম। এই অন্তরের সংগ্রাম বাইরের সংগ্রামের থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটা না থাকলে মানুষ যথার্থ মানুষ হবে না, দুষ্ট মানুষের সংখ্যা কমবে না, অন্যায় নিবারণের ব্যবস্থা করার মত লোকের অভাবও দূর হবে না। তবে এটা কঠিনতর পথ, কেননা এই সংগ্রামে মনই মনের বন্ধু, আবার মনই মনের শত্রু।

স্বামীজী নানাভাবে জীবনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এক জায়গায় বলছেন, "যা nature-এর against-এ rebel করে, তাই চেতন; তাতেই চৈতন্যের বিকাশ রয়েছে। দেখ না, একটা সামান্য পিঁপড়েকে মারতে যা, সেও জীবনরক্ষার জন্য একবার rebel করবে। যেখানে struggle, যেখানে rebellion, সেখানেই জীবনের চিহ্ন -- সেখানেই চৈতন্যের বিকাশ (প্রকাশ)।" মানুষের ক্ষেত্রে জীবনের চিহ্ন বেশী প্রকাশ পায় অল্প বয়সে। যুবকেরা যখন প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকে, দেহে বল, মনে আশা আর বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য থাকে, তখন তারা অন্যায়-অবিচার দেখে প্রতিবাদ করে, সমাজের সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য সংগ্রাম করতে

চায় । নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য অল্প বয়সে যে চেষ্টা থাকে, অনেক ক্ষেত্রে সেটাও ভেতরের সংগ্রামকে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা সমাজের নানা অন্যায়, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা -- সব কিছুকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে শুরু করে । মনে করে, এ সবের কোনও সমাধান নেই । অনেকেরই আর প্রতিবাদের স্পৃহা থাকে না, অন্যায় অবিচারের সঙ্গে আপস করে তারা নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবন কাটাতে চায় । নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন, কৈশোরে অথবা যৌবনের প্রারম্ভে যখন যুবকরা আদর্শের টানে সমাজসেবার কাজে আসে, তাদের দেখে আমরা উৎসাহিত হই, মনে মনে তাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখি । কিন্তু কিছুদিন পরে যখন তারা কোন চাকরীতে প্রবেশ করে, তারা ক্রমশ ভোগবাদী জীবনে আসক্ত হয়ে পড়ে, তাদের কাছে আর বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করা যায় না ।

নিশ্চিন্ত নিরাপদ ভোগসর্বস্ব জীবনের হাতছানি আমাদের মোহিত করে । আমরা সংগ্রাম এড়িয়ে চলি, যাতে সুখস্বপ্নে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে । এই অবস্থায় মানুষ উচ্চ আদর্শ সম্পর্কে ধারণা করতে পারে না । স্বামীজী বলেছিলেন, বেশীর ভাগ মানুষ তাঁকে বুঝতে পারে নি । বলেছেন, "তাহাদের চক্ষু নিজেদের দৃষ্টিসীমার বাহিরে আর কিছু দেখিতে পায় না । তাহাদের নিয়মিত কার্য - আহার, পান, অর্থোপার্জন ও বংশবৃদ্ধি - যেন গণিতের নিয়মে অতি সুশৃঙ্খলভাবে পর পর সম্পাদিত হইয়া চলিয়াছে । ইহার অতিরিক্ত আর কিছু তাহারা জানে না । বেশ সুখী তাহারা ! তাহাদের ঘুমের ব্যাঘাত কিছুতেই হয় না । শত শত শতাব্দীর পাশব অত্যাচারের ফলে সমুত্থিত শোক, তাপ, দৈন্য ও পাপের যে কাতরধ্বনিতে ভারতাকাশ সমাকুল হইয়াছে, তাহাতেও তাহাদের জীবন সম্বন্ধে দিবাস্বপ্নের ব্যাঘাত হয় না ।"

স্বামীজী আমাদের শিখিয়েছেন, কোন অবস্থাতেই আদর্শের বিষয়ে আপস চলবে না । তিনি বলেছেন, আদর্শ কখনও সমাজকে অনুসরণ করে চলতে পারে না, বরং সমাজেরই আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে । কিন্তু আমাদের মধ্যে কেন এমন আপসের ভাব এসে পড়ে ? আসলে কৈশোর আর যৌবনে নব প্রাণস্পন্দন যে মহতের আহ্বান এনে দেয়, সে বিষয়ে গভীর বোধ জাগানোর শিক্ষা না থাকায় আমরা তার যথার্থ মূল্য ধারণা করতে পারি না । ওপর ওপর কিছু ভাল জিনিসের চর্চা করেই আমরা অনেক সময়ে মনে করি, খুব সংগ্রাম করছি । শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতার কথা বলতে গিয়ে একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন । এক শিষ্য তার গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছে, ঈশ্বর লাভের জন্য কতটা ব্যাকুলতা চাই। গুরু সরাসরি উত্তর না দিয়ে একদিন নদীতে স্নানের সময় শিষ্যকে জলে ডুবিয়ে ধরলেন । শিষ্য যখন শ্বাসগ্রহণের জন্য ছটফট করছিল, তখন তিনি তাকে ছাড়লেন । এভাবে তাকে শেখালেন, ঈশ্বর লাভের জন্য যখন এইরকম ছটফটানি আসবে, তখন বুঝবে - সময় হয়েছে। আমরাও যখন এইভাবে নিজেদের মনের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে একটা তীব্র অসন্তোষ অনুভব করব, তখনই স্বার্থপরতা, লোভ, ঘৃণা, ঈর্ষা, অহংকার প্রভৃতির বিরুদ্ধে সত্যিকারের সংগ্রাম করতে পারব । সাময়িক ভাবালুতা থেকে এটা হবার নয় । জীবনে কিসের কতটা যথার্থ মূল্য, সেটা স্বচ্ছ চিন্তা দিয়ে বুঝতে হবে; আর যেটা আসলে মূল্যবান, সেটা

পাওয়ার জন্য সংকল্পের দৃঢ়তা নিয়ে লেগে পড়তে হবে, ধৈর্য ধরে একটানা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। শক্তি খরচ না করে কি কখনও সংগ্রাম হয়? কোনও কষ্ট করতে হবে না, কিছুই ছাড়তে হবে না, হারাতে হবে না, এমন সংগ্রামের কথা কে কোথায় শুনেছে?

সংঘবদ্ধ প্রয়াসের ক্ষেত্রেও একই সংকট দেখা যায়। উৎসাহী কিছু যুবক যখন একটা বড় আদর্শকে সামনে রেখে কাজে লেগে পড়ে, তখন তাদের মধ্যে থাকে মানুষের জন্য সহানুভূতি, কর্মতৎপরতা ও অধ্যবসায়। কোন বাধাই তাদের কাছে বাধা বলে মনে হয় না। সমাজের উপেক্ষা, অবজ্ঞা, বিরুদ্ধাচরণ, আর্থিক অনটন প্রভৃতি সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই সব যুবকেরা তাদের দেহের শক্তি, মনের বল এবং হৃদয়ের প্রেরণা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে। প্রাথমিক সাফল্য এনে দেয় অপ্রত্যাশিত প্রশংসা। বাড়তে থাকে কাজের পরিধি, কোথাও গড়ে ওঠে দালান বাড়ী। অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু জনসংযোগ বাড়লেও কমতে থাকে হৃদয়ের যোগ। কমে আসে অনুভবের তীব্রতা। তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে আত্মসন্তুষ্টির ভাব। যেটুকু সাফল্য লাভ হয়েছিল, তার স্মৃতি মোহিত করে রাখে কর্মীদের। সংগ্রাম তখন হয়ে পড়ে কথার কথা মাত্র।

আমাদের সতর্ক হতে হবে, যাতে এই রোগ আমাদের মধ্যে প্রবেশ না করে। স্বামীজীর আগুনে জীবন ও বাণীর সান্নিধ্য আমাদের হৃদয়ের আগুনকে নিয়ত জ্বেলে রাখবে। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, নিরন্ন, নিপীড়িত মানুষের ব্যথা যেভাবে স্বামীজীর হৃদয়কে তোলপাড় করত, তা গভীর ভাবে অনুভব করতে হবে। স্বামীজীর বাণী যেন অহরহ ধ্বনিত হয় আমাদের কাণে -- "সংগ্রাম! বিগত দশ বছর ধরে সংগ্রামই ছিল আমার আদর্শ। এখনও বলছি, সংগ্রাম করো। যখন চারদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না, তখনও বলেছি, সংগ্রাম করো। যখন আলো আসতে শুরু করেছে, তখনও বলছি, সংগ্রাম করো। ভয় পেয়ো না, বৎসগণ !"

আমরা যদি আমাদের ব্যক্তি জীবনকে সমাজের কল্যাণের জন্য তৈরী করতে চাই, তা হলে সংগ্রাম শুরু করতে হবে অন্তরের শত্রুর সঙ্গে। কর্মীদের ব্যক্তিজীবনে এই সংগ্রামই সঙ্ঘজীবনের শুদ্ধতাকে নিশ্চিত করবে । ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত - এই উভয়বিধ প্রচেষ্টা আনবে যথার্থ সাফল্য।

স্বামীজী আমাদের এই আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন, "মানুষ সংগ্রাম শুরু করে এবং প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে। সে অনেক ভুল করে এবং কষ্ট পায়। অবশেষে সে প্রকৃতিকে জয় করে এবং নিজের যথার্থ স্বাধীনতা উপলব্ধি করে। যখন সে স্বাধীন, প্রকৃতি তার দাসে পরিণত হয়।" সুতরাং ভুলত্রুটীর গ্লানিকে উপেক্ষা করে আমাদের জীবনব্যাপী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।